Website: https://www.parthasarathipatrika.com

৪৫তম অন্তর্জাল সংখ্যা

৭ই পৌষ, ১৪৩০ / 24.12.2023

—:— সম্পাদক —:—

সুনন্দন ঘোষ

DO NOT COPY

-: সূচীপত্র :-

যীশুখ্রীষ্ট ও স্বামীজি	শ্রীপ্রীতিকুমার ঘোষ
একটি চিঠি	শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ
মায়ের আহ্বান	শ্রীমা
যোগবাণী	পরমহংস যোগানন্দ
নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও স্বামী বিবেকানন্দ	শ্রী বীরেন্দ্র চন্দ্র সরকার
পরিব্রাজক কৃষ্ণানন্দ	শ্রী অমরেন্দ্রকুমার ঘোষ
বড়দিন	শ্রী শান্তশীল দাশ
মাইকেল কলিন্স, একটি পর্বতাভিযান ও আমরা কয়েকজন	শ্রী সুনন্দন ঘোষ

PARTHASARATHI: RNI 5158/ 60 for print format: converted to e-magazine by Publisher: Sunandan Ghosh during prolonged Nationwide Lockdown in 2020.

Website: https://www.parthasarathipatrika.com

Contact: 182 Jessore Road, Flat- D1, Kolkata- 700074. WhatsApp: 9433284720

DO NOT COPY

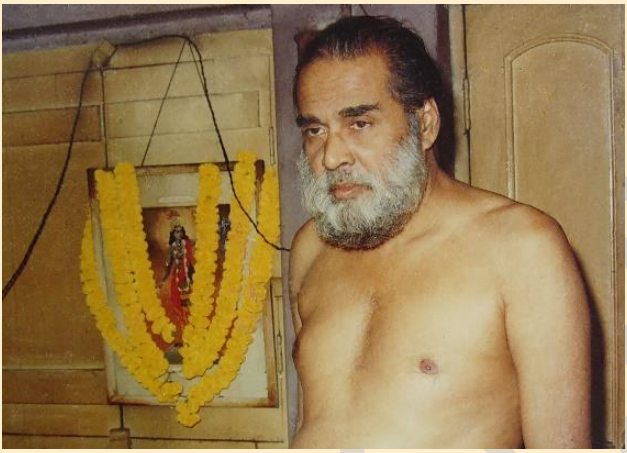

(১০ই মার্চ, ১৯২৬ – ২৪শে নভেম্বর, ১৯৮৬)

যীশুখ্রীষ্ট ও স্বামীজি **শ্রী প্রীতিকুমার ঘোষ**

সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে আচ্ছন্ন জগতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কম্বুকণ্ঠ হইতেই সর্বপ্রথম উচ্চারিত হইয়াছিল 'যত মত তত পথ' – এই উদার বাণী। সকল ধর্মই সত্য, ঈশ্বরে উপনীত হইবার এক একটি স্বতন্ত্র পথ। ঠাকুরের এই উদার বাণী শুধু কথার কথা ছিল না। ইহা ছিল তাঁহার সাধনালব্ধ উপলব্ধি। তিনি বৈষ্ণব, তন্ত্র, অদ্বৈত, সুফী, খ্রীষ্ট সকল মতেই সাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

ঠাকুর যীশুখ্রীষ্টের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতি ঠাকুরের প্রগাঢ় ভক্তির কথা সর্বজনবিদিত। প্রতি প্রাতে তিনি যীশুখ্রীষ্টের উদ্দেশে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিতেন। চলার পথে গীর্জা দেখিলে তিনি শুধু প্রণাম করিতেন তাহাই নহে, কখনও কখনও বাহিরে সশ্রদ্ধচিত্তে দাঁড়াইয়া থাকিতেন। খ্রীষ্টোপাসনা দর্শনের কৌতূহলে তিনি লঙ সাহেবের গীর্জায়ও গমন করিয়াছিলেন।

DO NOT COPY

ঠাকুরের প্রিয়তম শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ, যাঁহাকে ঠাকুর তাঁহার সকল শক্তি দান করিয়া 'ফকির' হইয়াছিলেন, তিনিও ঠাকুরের মতো সকল ধর্মের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা পোষণ করিবেন, ইহাই স্বাভাবিক। স্বামীজির লেখা ও বক্তৃতায় সকল ধর্মের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ পাইয়াছে। তবে খ্রীষ্টদেবের প্রতি স্বামীজির বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। ঠাকুরের প্রভাবই ইহার মুল কারণ, সন্দেহ নাই। তবে অন্য কারণও আছে। ব্রাহ্মধর্মের উপর খ্রীষ্টধর্মের প্রভাব অনস্বীকার্য। ব্রাহ্ম ধর্মের প্রবর্তক রাজা রামমোহন রায় "Precepts of Jesus, a guide to peace and happiness" নামক একখানি পুস্তিকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। নববিধান ব্রাহ্ম সমাজের প্রবর্তক কেশব চন্দ্র সেন বোধহয় যীশুখ্রীষ্টের বাণী ও ব্যক্তিত্বে সর্বাধিক প্রভাবিত হইয়াছিলেন। তাঁহার অসংখ্য বক্তৃতা, বিশেষ করিয়া, তাঁহার 'India asks, who is Christ?' বক্তৃতায় এই প্রভাব খুবই সুস্পষ্ট। রোমাঁ রোলা বলিয়াছেন, "Christ had touched him and it was to be his mission in life to introduce him into the Brahma Samaj, and into the heart of a group of the best minds of India." স্বামীজি আদিতে ব্রাহ্ম সমাজের সভ্য ছিলেন, তাছাড়া তিনি এক বৎসর হিন্দু কলেজেও অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তখন কেশব চন্দ্র সেনের বক্তৃতা তিনি নিশ্চয়ই শ্রবণ করিয়া থাকিবেন। যীশুখ্রীষ্টের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তির ইহাও অন্যতম কারণ বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে।

স্বামীজি যখন সর্বপ্রথম বিলাতে যান তখন ইংরেজ জাতির প্রতি তাঁহার কোন শ্রদ্ধাই ছিল না। কিন্তু ইংরেজ জাতির সমুচ্চ নৈতিকতা ও ধর্মপ্রবণতা দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হন এবং তাহাদের ধর্ম – খ্রীষ্টধর্মের উদ্গাতা যীশুখ্রীষ্টের প্রতি সবিশেষ আকৃষ্ট হন। Imitation of Christ নামক বিখ্যাত পুস্তকখানি তিনি বাংলায় অনুবাদ করেন। মূল পুস্তকখানি সর্বদাই তাঁহার সঙ্গে থাকিত। খ্রীষ্টধর্মের ত্যাগ ও বৈরাগ্যের

শিক্ষা তাঁহাকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করে। “Give up all that thou hast and follow me.” “Whosoever shall lose his life for my sake, shall find it.”- কথাগুলি তাঁহার অন্তরে সুগভীর রেখাপাত করিয়াছিল।

ইউরোপ ভ্রমণকালে তিনি সশ্রদ্ধচিত্তে অনেক গীর্জা ও ভজনালয় পরিদর্শন করিয়াছিলেন। বড়দিনের উৎসবে যোগদানের জন্যে তিনি রোমে গিয়াছিলেন আবার মিলানে গিয়া ডি ভিঞ্চির আঁকা Last Supper চিত্রের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছিলেন। ক্যাথলিক চার্চের আচার অনুষ্ঠান তাঁহার ভাল লাগিত। হিন্দুধর্মের আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে তিনি ইহার যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টের বাণীর মধ্যেও তিনি বেদান্তের বাণীর প্রতিধ্বনি শ্রবণ করিয়াছিলেন। যীশুখ্রীষ্ট বলিয়াছিলেন, “I am the son of God.” “I and my father are one.” বেদান্তের শিক্ষাও ‘সোহহম্।’

যীশুখ্রীষ্টের দিব্যত্ব সম্পর্কে ভিন্ন লোকের ভিন্ন মত আছে। ইউনিটারী চার্চ তাঁহাকে একজন মহাপুরুষের বেশী সম্মান দিতে স্বীকৃত হয় নাই। এদেশে রাজা রামমোহন রায় তাঁহাকে শাশ্বত সত্যের উদ্গাতা একজন ধর্মপ্রবর্তক বলিয়া মনে করিতেন, কিন্তু বিবেকানন্দের কাছে তিনি ছিলেন স্বয়ং ঈশ্বর। স্বামীজি বলিয়াছেন, “If I, as an oriental, am to worship Jesus of Nazareth at all, there is only one way open to me, and that is to worship him as god and nothing else.” সুইজারল্যান্ডে তিনি একবার মাতা মেরীর পদমূলে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেন, আর শিশু যীশুর দিকে চাহিয়া বলেন – আজ যীশু সশরীরে থাকিলে আমি অশ্রু নয়, হৃদয় রুধিরে তাঁহার পদ ধৌত করিতাম। – “I would have washed his feet, not with my tears, but with my heart’s blood.”

Christ, the Messenger- নামক বক্তৃতায় স্বামীজি আবেগমথিত ভাষায় যীশুখ্রীষ্টের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তাঁহার কাছে যীশু মানুষ নয় – দেহহীন, শৃঙ্খলহীন, বন্ধনহীন একটি শাশ্বত আত্মা যিনি এই জীবনের পারে অনন্ত জীবনের সন্ধান দিয়েছেন, যাঁর জীবন মানুষের সুপ্ত আধ্যাত্মিকতাকে জাগ্রত করিবার একটি জ্বলন্ত আহ্বান বিশেষ।

স্বামীজির জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা। ইউরোপে মধ্যযুগে চার্চই চিরকাল শিক্ষাবিস্তার ও আর্তজনের সেবা করিয়া আসিয়াছে। এ দেশেও খ্রীষ্টান মিশনারীরা শিক্ষাবিস্তার ও আর্তজনের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টধর্মের এই সেবাদর্শ, খ্রীষ্টান মিশনারীদের সেবার মহান দৃষ্টান্ত স্বামীজির জীবনে নিশ্চয়ই প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকিবে। স্বামীজীও সেবাধর্মের আদর্শ গ্রহণ করেন এবং দেশবাসী বিশেষ করিয়া যুবসম্প্রদায়কে সেবাদর্শে অনুপ্রাণিত করেন। তবে সেবাধর্মকে স্বামীজি একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিয়াছিলেন। জীবই শিব, নরের মধ্যেই নারায়ণ – এই জ্ঞানে জীবসেবা প্রবর্তনের জন্য তিনি ইউরোপ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন।

বহুরূপে সম্মুখে তোমার,
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর,
জীবে প্রেম করে যেই জন
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

জনসেবার এই যে আদর্শ স্বামীজি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, ইহার কোন তুলনা নাই। শিবজ্ঞানে জীবসেবার এই আদর্শ ও অনুপ্রেরণা তিনি ঠাকুর রামকৃষ্ণের নিকট হইতে লাভ করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। তবে রামকৃষ্ণ মিশনের মাধ্যমে তিনি যে ধারায় সেবাধর্মের প্রবর্তন করেন তাহার সহিত খ্রীষ্টীয় রীতির সাদৃশ্য লক্ষ্যণীয়।

DO NOT COPY

একটি চিঠি **শুক্লা ঘোষ**

শ্রীচরণেষু ,

আবার চিঠি লিখতে বসলাম। আমি জানি আমার পক্ষে তোমাকে চিঠি লেখাটা খুবই সহজ। আজ আমি তোমার যত কাছে পৌঁছাতে পেরেছি, গত তিরিশ বছরেও আমার পক্ষে সেটা সম্ভব হয়নি। যদি আগে সম্ভব হত, তাহলে আমার অগ্রগতি রোধ করবার ক্ষমতা কারও ছিলনা। কিন্তু ১৯৫৬ সাল থেকে ১৯৮৬ পর্য্যন্ত কি করলাম আমি? কি পেলাম? কি দিতে পারলাম? তবে একটা কথা বলতে পারি – দিয়েছি যত নিয়েছি তার বেশী ..... ।

শেখাবার চেষ্টা করেছ অনেক। কিন্তু কিছুই শিখি নি। শেখবার চেষ্টা আজ করি। আমি জানি তুমি আমাকে কষ্টি পাথরে ঘষা আসল সোনার মত তৈরি করে নেবে। সেদিন আর আমি পিছন ফিরে তাকাব না। এখনই তো কত নিস্পৃহ হতে পারছি। এটা কি আগে চিন্তা করতে পেরেছিলে?

তোমাকে চিঠি লিখতে গিয়ে বড় কষ্ট হচ্ছে। 'পার্থসারথি'-তে আমার লেখার মধ্যে যাঁরা বাস্তবতার ছোঁওয়া খুঁজে পান, তোমার ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারেন, তারা নানা ভাবে আমার সাথে সংযোগ রক্ষা করেন, প্রশ্ন করেন, দেখা করেন এবং অনেকে আমাকে খুব ভালোবেসেও ফেলেছেন। আমি তাঁদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা জানানো ছাড়া আর কিই বা করতে পারি?

দীর্ঘ চার বছর পার হয়ে গেল আমরা তোমার সাহচর্য থেকে বঞ্চিত। কিন্তু তুমি একটি কথা প্রমাণ করে দিয়েছ – "দেহ থাকলে আমি যা করতে না পারি, দেহ ত্যাগ করলে তার চেয়ে অনেক বেশী কাজ করতে পারি ...." এ কথা তো সত্যিই। তোমার ওই স্নেহময় প্রভাব না থাকলে একটি দিনও কি আমাদের কাটতো? কি কঠোর সংগ্রাম আমাদের করতে হল ! যত বিপদ ঘটুক না কেন এটা তো ঠিক যে আমরা ধৈর্য, সাহস, নির্ভরতা নষ্ট করিনি। যে পরিস্থিতির মধ্যে আমাদের রেখে গেছিলে সেটা কি সাধারণ লোকের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব ছিল? আমি তোমার স্ত্রী

বলে পেরেছি। বাপী তোমার সন্তান বলে পেরেছে। কত কষ্ট সে পেলো ! তবে তার সঙ্গে তোমার কোনও একটা সূত্রে যোগাযোগ আছে এটা আমার বিশ্বাস। কিন্তু আমি? আমার তো শুধু বিশ্বাস আর নির্ভরতা। আর এই বিশ্বাস থেকেই খুব শীঘ্র আমি একটা নূতন খবর পাবার জন্য অপেক্ষা করছি। তুমি এত দেরী করছ কেন? একটা কিছু কর!

এই দীর্ঘ চার বছরে অনেক তীর্থে ঘুরলাম। একটা জিনিস দেখলাম, আমার এই তীর্থই সেরা তীর্থ। তবু মাঝে মাঝে উধাও হয়ে যেতে ইচ্ছে করে। কারণ ? কারণ তোমার দীর্ঘদিনের কিছু দাঁত চেপে কথা বলা, তোষামোদ করা, মেকী ভালোবাসা দেখানো ভক্তবৃন্দের আনাগোনা। তার মধ্যে অবশ্য কয়েকজন আমাদের যা উপকার করেছেন আমি জীবন দিয়েও তা শোধ করতে পারব না। আর সেটা আমি বারবার তাদের কাছে স্বীকার করেছি। জানি না আর কিভাবে কৃতজ্ঞতা জানানো যায় ! .....

তবে বিপদ আমার অনেক বেড়েছে। তোমার কাছে যারা কোনও প্রার্থনা নিয়ে আসতেন, তুমি তাদের দিকে একটু মুচকী হাসলেও কাজ হয়ে যেতো। কিন্তু আমি? আমি তো অট্টহাসিতেও তাদের শান্তি দিতে পারিনা। তাই আমাকে তাদের জন্য দোল, দুর্গোৎসব, জন্মদিন, বিবাহবার্ষিকী ইত্যাদি পালন করে মরতে হয়। পেরে উঠিনা। কারণ উৎসবগুলি তো শুধুমাত্র মাসের প্রথমে হয় না, মাসের শেষেও হয়। তখন তোমার কথা খুব মনে পড়ে। ঐ সময়ে মাঝে মাঝে তোমার উদ্দেশ্যে কটূক্তিও করতে ছাড়িনা।

“পার্থসারথি” নিয়ে তোমার খুব চিন্তা ছিল। এখন অনেক গ্রাহক নিজে থেকে নাম Renew করে নেন। বাপী ও আমি প্রকৃত পরিশ্রম করি পত্রিকাটিকে টিঁকিয়ে রাখবার জন্য। তোমার আশীর্বাদ না থাকলে একাজ কি আমার দ্বারা সম্ভব হতো?

সবচেয়ে মজা কি জান? কিছু গ্রাহক আছেন বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্তও বার্ষিক চাঁদা দেন না। কিন্তু যেই তাদের টাকা পাঠান, কি ফরমাস করে চিঠি লেখা!

এটা কেন হয়নি? ওটা কেন পাইনি? ইত্যাদি ইত্যাদি। মাঝে মাঝে কড়া করে জবাব দিতে ইচ্ছে করে, পারি না। তোমার নীরবতার পন্থাই ভালো মনে হয়। কথায় তো কথাই বাড়ে।

এই প্রসঙ্গে একটি দুঃখের কথা জানাই। তোমার সুহৃদ, কারমাটারের ডঃ পি. সি. মুখার্জি আর ইহলোকে নেই। গত চার বছর ধরে কত যত্ন করে গ্রাহক করেছেন, লিস্ট করে টাকা পাঠিয়েছেন। দরকার মতো চিঠি দিয়েছেন। তাঁর অভাব "পার্থসারথির" পক্ষে অপূরণীয় ক্ষতি। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি। তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জানাই। আমি আশা করবো পার্থসারথির মাধ্যমে এই দীর্ঘকালীন সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ হবে না।

এবার তোমার কাছে কয়েকটি প্রার্থনা আছে।

প্রথমতঃ তোমার পুত্রের সমস্যাগুলির দ্রুত সমাধান হোক।

দ্বিতীয়তঃ আমার এই কঠিন সংগ্রামের অবসান হোক। সেই যে ১৯৫৬ সালে চলা শুরু করেছি, আর থামব কবে ?

তৃতীয়তঃ আমাকে আরও ধর্মপরায়ণতা, আরও নির্ভরতা দাও।

আমি তোমার স্থিতিতে ভালো বাকসিদ্ধ ছিলাম। এখন কেন তেমন হতে পারিনা? আগে কারও উপর রেগে গেলে দুম করে একটা কথা বলে বসতাম। তুমি তাই নিয়ে খুব হাসাহাসি করতে। যাকে বলতাম, সেও আমার কাছে ক্ষমা চাইতো। কিন্তু এখন আর আমি তেমন করে রাগ করতে পারি না কেন?

পার্থসারথি আমরা চালাতে পারবো তো? অবশ্য দেশভ্রমণে আমার প্রচুর খরচ হয়। সেখানে তো তোমার স্নেহধন্যা শ্রীলা খুব সহায়তা করে। গীতাদি, কিশোর সকলেই আমার প্রতি সহানুভূতিশীল। তাই যেভাবেই হোক আমার দুঃখের মধ্যেও দিন কেটে যায়।

আমার খুব ইচ্ছে তোমার অনূদিত "গীতা" আরেকবার পুনর্মুদ্রণ করি। অত খরচ আমি দিতে পারবো না। এ ব্যাপারে সহায়তা ছাড়া আমার এগোবার উপায় নেই। আমার একার পক্ষে সম্ভব হবে না। দেখ, যদি তোমার কৃপা হয়। তোমার

কৃপা থাকলে আমি অসাধ্য সাধন করে ফেলবো। তোমার ভক্তদের কাছেও আবেদন রইলো।

তোমার জন্মদিন এসে গেলো। আবার আমরা সবাই একত্রিত হব। সবাই মিলে তোমাকে স্মরণ করবো। তোমাকে গান শোনাবো। রকমারি পছন্দের রান্না করবো। যে গান তুমি এতদিন আমার কাছে শুনেছো, সে উচ্চকণ্ঠের গান নয়, এ গান অনেক নরম, মৃদু, শ্রুতি মধুর।

বর্তমানে আমি বিশেষ কারো বাড়ি যাই না। আমার অনেক আপনজন আসেন। সকলেই আমার দুঃখে দুঃখিত। মৃদু হেসে Receive করলেও তারা থেমে থাকেন না। চা খাবার আগেই জিজ্ঞেস করে ফেলেন, "তারপর? ও দিকের কি খবর? কিছু হলো?" উত্তর একটাই – "না।" তারপরও তারা অসম্ভব প্রশ্ন করেন ও জ্ঞান দেন। কি অদ্ভুতভাবে নীরবতা পালন করি আমি। মনে মনে ভাবি তোমার শারীরিক উপস্থিতিতে এ নীরবতা কি আমি পালন করতে পারতাম? আজ হয়ত তোমার আশীর্বাদে সেটা সম্ভব হচ্ছে। যাক ... বোকামি আমার অনেক আছে। তোমার উপযুক্ত হতে পারিনি। নিজেকে তোমার পছন্দের মতো তৈরি করতে চেষ্টা করছি। জানি না পারবো কিনা। আশীর্বাদ করো যেন সম্মান নিয়ে বাঁচতে পারি। হৃত সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করতে পারি। ..... ছোট ছোট বিঘ্নগুলোকে তুচ্ছ করতে পারি।

আজ শেষ করি .....।

প্রণাম রইলো।

ইতি -

শ্বেতা

– – – – – – – – – – – – – –

(** রচনাকাল - ফেব্রুয়ারি, ১৯৯১)

DO NOT COPY

এমন সব লোক আছে যারা দুঃসাহসের কাজ করতে ভালবাসে। সেই সব লোকদিগকেই আমি আহ্বান করে বলছি -

বিরাট দুরূহ কাজের জন্যই আমি তোমাদিগকে আমন্ত্রণ করি। এই দুঃসাহসিক সাধনায় আমরা সেই সব আধ্যাত্মিকতার পুনরাবর্তন করবো না যা অপরে অতীতে করেছে। আমাদের যাত্রা সুরু হবে পূর্বের আধ্যাত্মিকতার শেষ সীমানা থেকে। আমরা নতুন জগৎ সৃষ্টি করতে চাই, একেবারেই নতুন জগৎ। আমাদের সাধনার পথ অদৃষ্টপূর্ব বিপদ-আপদ সঙ্কুল। এই পথে চলা প্রকৃতই দুঃসাহসিকতা। সুনিশ্চিত বিজয়ই আমাদের লক্ষ্য, কিন্তু ইহার পথ আমাদের অজ্ঞাত। পদে পদে পথনির্মাণ করে আমাদিকে অগ্রসর হতে হবে। এই পথ চলেছে অজানার রাজত্বে। যে উপলব্ধি আমাদের লক্ষ্য তা এই বর্তমানের বিশ্বে কোনদিন প্রকাশিত হয় নাই, এবং এমন ভাবে আর কোনদিন প্রকাশিত হবেও না। এই লক্ষ্যের প্রতি তোমাদের যদি আকর্ষণ থাকে তাহলে চলে এসো আমরা যাত্রা করি। আগামীকাল আমাদের জন্য কী আনবে তা আমি জানি।

অতীতে যা দেখেছি, যা করবার সিদ্ধান্ত ইতিপূর্বে করেছি, মনে মনে যে সৌধ গড়ে তুলেছি- সে সবই পিছনে ফেলে আমরা অজানার পথে অগ্রসর হব- ভাগ্যে মোদের যা থাকে তা হোক। **

** শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের সৌজন্যে ...

DO NOT COPY

(অনুবাদক - স্বামী বিদ্যানন্দ গিরি)

জীবনকে চলচ্চিত্রের ছবির ন্যায় দেখ

এ জীবনে আমরা সকলেই চলচ্চিত্রের ছবি-অভিনেতা এবং তার অনুরাগী-ভক্ত। আমরা আমাদের অভিজ্ঞতার তামাসা দিয়ে অপরকে স্ফূর্তি আরাম প্রদান করি, অনুপ্রাণিত করি ও পরামর্শ দিয়ে থাকি এবং আমরা নিজেরাই অপরের জীবনের সতত পরিবর্ত্তনশীল মজার ছবি উপভোগ করি।

বৈচিত্রময় ঘটনা সমূহের ছবি ফিল্মে তোলা হয়, পূর্ব পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ-চতুর্দিকে নানা জাতি বহুবিধ রীতি নীতি ঐতিহ্য এবং উপজীবিকার বিভিন্ন দৃশ্যপটের এবং পরিবেশের অভ্যন্তরে বিচিত্র এবং রঙিন অভিনয়ের খোরাক জোগায় এবং চির-নতুন আকর্ষণীয় জীবন-ফিল্ম প্রস্তুত করনে অপরিমেয় সম্পদ এবং অশেষ উপকরণ প্রদান করে।

প্রতিদিন, যে কোন সময়, যে কোন স্থানে সাধারণ মানুষের মন-ক্যামেরা শিক্ষাবিষয়ক, উত্তেজনাকর, হাস্যকর, বিষাদময় এবং অনুপ্রেরণামূলক বিবিধ ছবি তুলছে। জীবনে বহু মজার ছবিও উঠছে। মহামানব তথা মহতী অভিযানকারীদের কথা – লিঙ্কন, গান্ধী, লিণ্ডবার্গ, বায়ারভ, এমারসন এবং সহস্র সহস্র এবম্বিধ ব্যক্তিত্ব সম্পন্নদের এবং ধর্মীয় দিকপাল আচার্য গুরুদেব যথা যীশু, বুদ্ধ, জোরোয়েষ্টার, কন্ ফুসিয়াস, মহম্মদ, শ্রীকৃষ্ণ এবং আরও অনেকের পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে জীবন চলচ্চিত্র দেখে আমরা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হই।

কল্পনায় অঙ্কিত মানসিক চলচ্চিত্রে সেক্সপিয়ারের বিয়োগান্ত নাটকের বা অন্যান্য মহান নাট্যকারদের রসময় নাটকের ছবির ন্যায় চিত্র আমরা দেখি, এ দ্বারা আমরা প্রভাবান্বিত হই এবং আমোদ প্রমোদ করি। পৃথিবীর ঘটনা সমূহের চিত্র,

দৈনন্দিন ঘটনা প্রবাহ, সংবাদ পত্র দ্বারা পরিবেষ্টিত খবরাদি আমাদের আগ্রহকে সঞ্জীবিত করে ধরে রাখে। অপরাপরদের কায়ক্লেশাদির ছবি আমাদের অশ্রুসিক্ত করে তোলে, তাদের সাহায্য করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হতে বলে। তাদের দুঃখের সুযোগে তাদের সাহায্যকল্পে আমরা আমাদের আনন্দ খুঁজে পাই। দেবতারা মর্ত্তবাসীদের সাহায্য করে, সহানুভূতি দেখিয়ে নিজেরাই আনন্দ উপভোগ করে। যদি তাঁরা অপরের দুঃখের সঙ্গে একীভূত হয়ে দুঃখে ভেঙ্গে পড়ত, কিংবা কান্নায় বুক ফাটাত, তা হলে তাঁরা সাহায্য করতে পারত না। কারণ দুঃখ দুঃখকে বাড়ায়, তাকে হ্রাস করতে কিংবা অপসারণ করতে পারে দৃঢ়চেতা সুখী মনের বীর্য্যবান প্রলেপ। সেইজন্য দুঃখময় ভ্রান্তি কিংবা অপরের জীবনের দুর্ভাগ্য বা নিজের দুর্ভাগ্য দেখে আমাদের আনন্দাশ্রুই অনুভব করা উচিৎ কারণ আমাদের দক্ষতা এবং চরম ক্ষমতা রয়েছে অপরকে সাহায্য করার। ঈশ্বরের প্রতিরূপ শিশুদের মধ্যে তামসময় চাঞ্চল্যকর শোকের আবেশ থাকতেই পারে না।

প্রতিটি ব্যাষ্টি, যে অত্যন্ত দুর্বল, কিংবা বিষাদগ্রস্ততায় ভুগছে বা রক্তশূন্যতায় নিষ্ক্রিয়, অথবা জীবনের ন্যুনতম খাতে নৈরাশ্যময় – অপরের জীবনের বিয়োগান্ত ছবির নির্বাক দর্শকের ভূমিকায় এ ধরণের ব্যক্তিদের জীবনে কোন সার্থকতা নেই। তারা মূর্ছিত হয়ে কালক্ষেপ করে; দোষবহ আচরণের এ যে ফল সে শিক্ষা তারা গ্রহণও করতে পারে না এবং তা থেকে মুক্তও হতে পারে না, অপরের সাহায্যকল্পে তাদের পক্ষে এগিয়ে আসা সুদূরপরাহত। কারণ তারা নিজেরাই দুর্দশাগ্রস্ত।

সুতরাং, প্রত্যেকেই মানসিকভাবে সম্পূর্ণ প্রস্তুত থেকে সার্থকতার সঙ্গে অপরের জীবনের দুঃখময় অভিজ্ঞতা সমূহের গতিশীল চিত্র পর্যবেক্ষণ করা উচিৎ, যাতে অপরের জীবনের ছবিতে সাহায্য করতে পারে এবং এটা যে জীবন-চিত্র এ ভেবে নির্লিপ্ততার হাসি তামাসায় জীবন কাটাতে পারে।

ইউরোপ এবং এশিয়া তথা বিশ্ব-যুদ্ধ, ভূমিকম্প এবং বন্যায় আকস্মিক বিপর্যয়, দুর্ভিক্ষ, সুখের উন্নত কালসমূহ, পৃথিবীর মহাপুরুষদের প্রভাব,

রাজনীতিবিদ্ এবং দুরাত্মাগণ, যুগ যুগের প্রতিভাবানদের ব্যাপক কর্ম – কবিগণ, ব্যবসায়ীগণ, লেখকগণ, দুঃসাহসিক সংস্কারগণ, মহান্ প্রেমিক এবং নায়কগণ – এ সমস্ত ঘটনা প্রবাহ এবং এই বিভিন্ন চরিত্রের অভিনেতারা নিজ নিজ অভিনয়ের অংশ শতাব্দীর পর শতাব্দী বিশ্ব রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করে গিয়েছেন।

প্রতিটি বিষয়ে দীর্ঘ সময় লেগেছে, প্রতিটি বিষয় মানুষের চেতনায় দীর্ঘ সময় হয়েছে বলে মনে হয়েছে। প্রতিটি জীবন যেন মনে হয়েছে শেষহীন, প্রতিটি মহান্ ঘটনাই যেন মনে হয়েছে সব নিঃশেষকারী কিন্তু যখন জীবনের অধীশ্বর, যমরাজ বলেছেন – "cut!" জীবন নাটক তখনই সমাপ্ত। মহৎ-জীবন গুচ্ছ, জটিল আঁট বাঁধা অস্তিত্বের সমাহার, সমগ্র জাতির ইতিহাস, তোমার জীবন্ত এবং আমার জীবন, ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান (অবশ্য যদি আমরা দেখতে পাই), যা মনে হয়েছে যেন অতি স্বল্পে, অতি মন্থরে কিন্তু নিশ্চিতই টেনে হিঁচড়ে এগিয়ে চলেছে তা' কখনই ফিল্মে তোলা যাবে না, কিন্তু প্রতিটি জীবনকে কয়েক ঘণ্টায় দেখান হচ্ছে। একশত বৎসরের জীবন যেন মনে হয় কত দীর্ঘ, যেন আর শেষ হয় না যখন অবশ্য মন্থর মানসিক ক্যামেরায় দেখা যায়, কিন্তু অন্তর দর্শনের দ্রুত গতিসম্পন্ন ক্যামেরায় বহু ঘটনা বিধৃত দৃশ্যাবলী এক পলকে দৃষ্টিগোচর হয়।

এ জীবনটা কি চলচ্চিত্র নয় যাতে পরিদৃশ্যমান লক্ষ লক্ষ ভূ-তাত্ত্বিক বর্ষ, আকাশের নক্ষত্রমন্ডলী, ভাসমান বাষ্প, পারমানবিক সংশ্লেষণ, পার্থিব বস্তু সামগ্রী, সমুদ্র, দেশ, জাতি এবং তাদের ইতিহাস, লক্ষ লক্ষ জন্ম এবং প্রতি শতবর্ষে পৃথিবীর অধিবাসীদের মৃত্যুতে সামগ্রিক পরিবর্ত্তনের চেহারা, বিভিন্ন বিষয়ের মহান বুদ্ধিজীবি, অধ্যাত্ম জ্ঞানী এবং জাগতিক সভ্যতা ও তার উত্থান-পতন? এই দৃশ্যাবলীর পটভূমিকায় আমরা জীবনকে অন্তর্দর্শনে ব্যাপকভাবে চির-পরিবর্ত্তনশীল, চির-নতুন, সতত চিত্তবিনোদনের শক্ত ফিল্ম বলে দেখতে পারি। জীবনটা দৃশ্যসমাহারের ছবি, পর পর সাজিয়ে এবং ক্রমান্বয়ে দেখান হয়, যা যথেষ্ট কৌতুকপ্রদ, সর্বদা সজীব, চিত্ত উত্তেজনাময় এবং জটিল। অসীম ক্ষমতাশালী এবং পৃথিবীর পরিবর্ত্তনকারীগণ যেমন, যীশু, বুদ্ধ, সক্রেটিস, অশোক, মহম্মদ, সিজার, উইলিয়াম দি কন্‌কারার,

ডারউইন, কোপারনিকাস, গ্যালিলিও, নিউটন এবং আরও অনেক অগ্রদূতগণ এবং নেতৃবর্গ, জীবন-চলচ্চিত্রের এক একজন মহানায়ক যাঁরা দর্শকবৃন্দের সার্বজনীন দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

জীবন ছবি সব সময়ই বিভিন্ন ধরণের হতে হয় আনন্দ পেতে হলে। কেউই একই মিলনান্ত জীবনের ছবি বা একই বহু পুরানো ঘটনা বা ভয়ানক হৃদয় বিদীর্ণকারী দুঃখান্ত মূলক জীবন ছবি সব সময় দেখতে চায় না বা কারুরই ভাল লাগে না। সকলেই চায় বৈচিত্র এবং কদাচই একই ছবি দুবার দেখে থাকে। তাইতো জীবন চলচ্চিত্রের মহান পরিচালক সততই বৈচিত্রময় জীবনের অবতারনা করেন। একই প্রবাহমান জল তুমি দুবার পান করতে পার না, একই ঘটনা তুমি কখনই দুবার দেখতে পার না। জল প্রবাহিত হয়ে যায়; ঘটনার পট পরিবর্তন হয়; তুমি এখন আর সেই লোক নও যে এক সেকেন্ড পূর্বে ছিল – তোমার চিন্তা পরিবর্ত্তিত হয়েছে, তোমার সামগ্রিক সত্ত্বা আর একই আনুপাতিক হারে নেই।

তা হলে জীবনকে মাত্র চলচ্চিত্রের তামাসা বলে ধরে নাও না কেন? তা করতে হলে দুঃখের বিরুদ্ধে তোমার মনকে ইস্পাত সদৃশ করতে হবে। তোমাকে বৈচিত্রের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। তুমি চলচ্চিত্রের একজন খেলোয়াড়, একজন চিত্ত বিনোদনকারী, একজন দর্শক, তোমার নিজের এবং অপরের জীবন-ছবির। যখনই তোমার অভিনয়ের মধ্যে সংগ্রাম করতে হবে রোগের বিরুদ্ধে, অকৃতকার্য্যতার বিরুদ্ধে, কিংবা দুর্ঘটনায় পতিত হয়ে খেলা দেখাতে হবে, তোমাকে স্মরণ রাখতে হবে যে তুমি অভিনয় করছ মাত্র।

যেমন চলচ্চিত্রের অভিনেতা তার চরিত্র ফোটাতে দুঃখের অভিনয় করে মাত্র তা' দ্বারা স্পর্শিত হয় না, সেই রকম তোমাকেও জীবন অভিনয়ে পরিবর্ত্তনশীল ছবিতে অনিবার্য্য দুর্ভাগ্য, অসুস্থতা, সহসা বিফলতা, এবং অদৃষ্টপূর্ব জীবনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অচল, অটল, নির্লিপ্ত থাকতে হবে। মানুষের চেতনায় অসুস্থতা, অসফলতা, শোক অতি সরলভাবে আপাত সত্যের মাপকাঠিতে অবস্থান করছে।

DO NOT COPY

কিন্তু শুদ্ধ-সত্ত্ব-চেতনায় অন্তরজ্ঞানে এ সব আদৌ অনুভূত হয় না। অমৃতের সন্তান হিসেবে সব সময়ই আমরা পূর্ণ এবং বিবেক বিচারের দ্বারা জীবনের তাৎপর্য এবং তার সমস্যা বিশ্লেষণ করে আমাদের সেই চৈতন্যকে পুনরুদ্ধার করতেই হবে।

জীবন-সিনেমাতে যদি তুমি নায়ক না-ও হও তা' হলেও গ্রাহ্য করবে না। কোন চলচ্চিত্রই একজন অভিনেতা বা একটি ঘটনা নিয়ে তৈরী ন্য। অভিনয়ে তোমার অংশ যদি অতি ক্ষুদ্র কিংবা নগণ্য হয় তবুও যথেষ্ট প্রাধান্য আছে, কারণ তোমাকে ছাড়া ছবিটি অসম্পূর্ণ। বিশ্ব পরিচালকের চোখে যে তার অংশটুকু, তা' যাই হউক না কেন, সুন্দরভাবে অভিনয় করে, সে-ই অমর জগতে তারকা সদৃশ ভাস্বরতা লাভ করে।

আমাদের অভিনয়ের বিষয় বস্তুটা কি তা না জানার জন্যই আমাদের ক্লেশ ভোগ করতে হয়। এই না জানার পরিণামেই সহজাত অন্তরজ্ঞানের আত্মবিকাশ ঘটে না। সর্ব অনুভবনীয়, সর্ব দর্শনকারী জ্ঞানকে উদ্দীপিত কর সতত ধ্যানের দ্বারা, তবেই তোমার অভিনয়ের বিষয় বস্তু জানতে পারবে। তখনই তুমি সুষ্ঠু অভিনয় করতে পারবে বা সার্থকতা নিয়ে অভিনয় করতে পারবে বা অপরের অভিনয়েও সতর্ক দৃষ্টি রাখতে পারবে, তা খুব মামুলী ঘটনারই অভিনয় হউক বা মিলনান্তের ভ্রমই হউক কিংবা দুঃখময় পরীক্ষার অভিজ্ঞতাই হউক, তখন মন থাকবে অন্তর্মুখীন। সেখানে তখন দুঃখের স্থান নেই, ক্ষোভ বা বিরক্তিও থাকবে না নিজের জীবন ছবি দেখতে বা খেলতে। অন্তর্মুখীন চেতনায় অধিষ্ঠিত থেকে মানুষ সমস্ত মহান অভিনয় করতে পারে আনন্দে, নির্লিপ্ত থেকে। বিশ্ব রঙ্গমঞ্চের সমস্ত চলচ্চিত্রই আমাদের চিত্ত বিনোদনের জন্য।

বিশ্ব জীবন চলচ্চিত্রের মহান পরিচালক সচ্চিদানন্দময়। আমরা তাঁর সন্তান হিসেবে তাঁরই প্রতিরূপে আনন্দময় রূপে সৃষ্ট। আনন্দ থেকে আমরা এসেছি, আনন্দেই আমরা বেঁচে আছি, আনন্দেই আমরা লীন হয়ে যাবো। ঈশ্বর মহাজাগতিক চলচ্চিত্র সৃষ্টি করেছেন তাঁর প্রীতির খেলার জন্য। যেহেতু আমরা অমৃত থেকে

DO NOT COPY

এসেছি, আমরাও সেই একই অধিচেতনার গুণাবলীর ধারক যা দ্বারা আমরা পর্য্যবেক্ষণ করতে পারি জীবন ছবি, জন্ম-মৃত্যুর ছবি, তথা পৃথিবীর সমুদয় ঘটনা চিত্র, সেই একই দিব্য আনন্দময় চেতনা নিয়ে। আমরা সিনেমাতে হয়ত বিয়োগান্ত ছবি দেখে বলি, "আহা! ছবিটি বড় উপভোগ্য ছিল!" তদ্রূপে তোমার নিজের জীবন পরীক্ষার ছবিতে নিশ্চয়ই বলবার সামর্থ রাখবে যে, "হো! আমার জীবনে ঘাত প্রতিঘাত পরাভূত করা খুবই মজার! এগুলো আমার ভ্রম দেখিয়ে দিতে উদ্দীপকের কাজ করছে এবং মনকে সঠিক পথে চলতে সাহায্য করছে যা' দ্বারা জীবনের শুচি শুভ্র আকর্ষনীয় আনন্দ সত্ত্বাকে লক্ষ্য করতে পারব।"

মানুষের চেতনা ঈশ্বর-চৈতন্যে তৈরী এবং সর্বদুঃখ নিরপেক্ষ। সমুদয় ভৌতিক এবং মানসিক ভোগের জন্ম দেহের সঙ্গে আমিকে সনাক্তকরণে, কল্পনা করায় এবং ভ্রমাত্মক চিন্তন অভ্যাসে। আমাদের জীবনে অতি বক্র, জটিল, বুদ্ধি ভ্রংশকারী পথে চলতে হবে এবং সেই সঙ্গে বহু অভিজ্ঞতার ছবি দেখতে হবে; মনে করতে হবে খেলাও দেখাচ্ছি। তখনই জীবন ও মৃত্যুকে অপরিবর্ত্তনশীল আনন্দময় চেতনা বলে মনে হবে। আমরা আমাদের চেতনাকে আত্ম চেতনার সঙ্গে অভিন্ন দেখতে পাব। আত্ম চেতনায় জন্ম জাগরণে কিংবা মৃত্যু নিদ্রায় নিরপেক্ষ থেকে আমরা দিব্য চলচ্চিত্র খেলাতে নিত্য নূতন অবিরত আনন্দ ধারা উপভোগ করব।

"হে ভারত, ইহাই প্রবল বিভীষিকা। পাশ্চাত্য-অনুকরণমোহ এমনই প্রবল হইতেছে যে ভাল বা মন্দের জ্ঞান আর বুদ্ধি বিচার শাস্ত্র বিবেকের দ্বারা নিষ্পন্ন হয় না। শ্বেতাঙ্গ যে ভাবের যে আচারের প্রশংসা করে তাহাই ভাল; তাহারা যাহার নিন্দা করে তাহাই মন্দ। হা ভাগ্য! ইহা অপেক্ষা নির্বুদ্ধিতার পরিচয় আর কি?"

--- **স্বামী বিবেকানন্দ**

নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও স্বামী বিবেকানন্দ **শ্রী বীরেন্দ্র চন্দ্র সরকার**

নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে কোন বিস্তারিত আলোচনার মধ্যে না গিয়ে, সুভাষচন্দ্রের জীবন ও কর্মপদ্ধতিতে স্বামীজীর যে প্রভাব দেখা যায়, কেবল সেই বিষয়ে কিছু একটু আলোচনাই এখানে আমাদের লক্ষ্য।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ৩৯ বৎসর বয়সে যখন স্বামী বিবেকানন্দ দেহরক্ষা করেন, সুভাষচন্দ্র তখন পাঁচ বছরের শিশু। কাজেই তাঁর পক্ষে স্বামীজীর সঙ্গলাভ এমন কি পুন্যদর্শনেরও সুযোগ ঘটিয়া ওঠে নাই। এজন্য সারাজীবন ধরিয়াই সুভাষচন্দ্রের মনে যে একটা প্রচ্ছন্ন বেদনাবোধ ছিল তার প্রকাশ পাওয়া যায় তাঁর নিজের কথা হইতেই – 'হঠাৎ নজর পড়ল স্বামী বিবেকানন্দের বইগুলির উপরে। কয়েকপাতা উল্টেই বুঝতে পারলাম এই জিনিষই এতদিন ধরে আমি চাইছিলাম। আদর্শের সন্ধান দিলেন বিবেকানন্দ। চেহারায় এবং ব্যক্তিত্বে বিবেকানন্দই ছিলেন আমার কাছে আদর্শপুরুষ। তাঁর মধ্যে আমার অজস্র জিজ্ঞাসার সহজ সমাধান খুঁজে পেয়েছিলাম। স্বামী বিবেকানন্দের পথই বেছে নিলাম। আজ যদি স্বামীজী জীবিত থাকিতেন, তিনি নিশ্চয়ই আমার গুরু হইতেন। তাঁকে নিশ্চয়ই আমি গুরুপদে বরণ করিতাম। যতদিন জীবিত থাকিব ততদিন রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের একান্ত অনুগত ও অনুরক্ত থাকিব।' স্বামীজীর দেশভক্তির আদর্শ সুভাষচন্দ্রের মনে যে কী গভীর রেখাপাত করিয়াছিল, আবাল্যবন্ধু স্বনামখ্যাত দিলীপকুমার রায় মহাশয়ের নিম্নোক্ত কথাগুলি হইতেও তার আভাস পাওয়া যায় – 'স্বামীজীর দেশভক্তির এই দিব্য আদর্শ যে সুভাষচন্দ্রকে আকৈশোর অনুপ্রাণিত করেছিল, এ আমার কথা নয়। বিনিদ্ররাতেই কতদিনই তার সঙ্গে এ আলোচনা হয়েছে আমার, শুধু এদেশে নয়, বিলেতেও। তাই আমি একথা অকুতোভয়েই বলতে পারি যে, যেমন শ্রীরামকৃষ্ণের তপঃশক্তিই বিবেকানন্দের প্রসূতি, তেমনি বিবেকানন্দের তেজঃশক্তিই নেতাজীর দেশাত্মবোধের জনয়িত্রী তথা ধারয়িত্রী ছিল প্রথম থেকেই।'

যে প্রবন্ধটি হইতে উপযুক্ত কথাগুলি উদ্ধৃত হইল (বিবেকানন্দ ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলন - সুনীল কুমার দাস - পার্থসারথি বিবেকানন্দ সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৮০)

উহারই একস্থানে প্রসঙ্গক্রমে প্রবন্ধকারকে বলিতে শোনা যায় - 'বিবেকানন্দের সর্বসত্তাই যেন সুভাষচন্দ্রের মধ্যে রূপায়িত হয়ে উঠেছে। বিবেকানন্দ পুরোপুরি রাজনীতিক হলে যা হতেন তাই সুভাষচন্দ্র।' চমৎকার কথা! স্বামী বিবেকানন্দ ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র উভয়ের প্রতিই কথাগুলি গভীর শ্রদ্ধাব্যঞ্জক সন্দেহ নাই। তবে ইহা সত্ত্বেও বলিতে ইচ্ছা হয়, আমাদের দিক হইতে স্বামী বিবেকানন্দ ও নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে কিন্তু এক করিয়া দেখা অথবা ভাবা অপেক্ষা উভয়কে পৃথক পৃথক ভাবে দেখিতে বা ভাবিতেই যেন বেশী ভাল লাগে। যদি সত্য সত্যই স্বামী বিবেকানন্দের সকল সত্তাই সুভাষচন্দ্রের মধ্যে রূপায়িত হইয়া উঠিত, তবে তো আর আমরা সুভাষচন্দ্রকে পাইতাম না, পাইতাম আর একজন বিবেকানন্দকেই। তেমনি করিয়াই যদি কিনা বিবেকানন্দ একজন পুরোপুরি রাজনীতিক হইয়াই দাঁড়াইতেন, সেক্ষেত্রে তিনি আর স্বামী বিবেকানন্দ থাকিতেন না, হইয়া যাইতেন আর একটি সুভাষচন্দ্রই। তাই আমাদের মনে হয়, থাকুন বিবেকানন্দ বিবেকানন্দ হইয়াই, আর সুভাষচন্দ্র সুভাষচন্দ্র রূপেই! থাকুন উভয়েই বাঙ্গালী তথা ভারতবাসীর চিত্ত পটে স্ব-স্ব মহিমায় – আপন-আপন বৈশিষ্ট্যে চিরভাস্বর হয়ে! অবশ্য এই যে কথাগুলি, এদ্বারা এরূপ বলা কখনও আমাদের অভিপ্রেত নয় যে, স্বামী বিবেকানন্দ ও নেতাজীর মধ্যে মূলতঃ অথবা আদর্শগত কোন গুরুতর ভেদ বিভেদ ছিল। বরং বলিতে গেলে বলিতে হয়, যদিও লৌকিক অথবা বাহ্যিকভাবে উভয়ের জীবনধারা ভিন্ন ভিন্ন পথেই প্রবাহিত হইয়াছিল তবুও কিন্তু ভাবাদর্শের দিক দিয়া উহাদের মধ্যে যতটুকু অমিল উহা অপেক্ষা মিলই ছিল অনেক বেশী।

এরপর স্বামীজীর নিজের সম্বন্ধে দেখা যায়, তাঁর চরিত্র ছিল অনেকের কাছেই দুর্জ্ঞেয়। এমন কি আপন গুরুভাইদেরও এজন্য কখনও কখনও ধাঁধায় পড়িতে হইত। এরূপ হইবার কারণ সম্বন্ধে মনে হয়, স্বামীজীর আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত সন্ন্যাসীর সাধনপদ্ধতি, বেশভূষা, আচার ব্যবহার, জাগতিক ও পারমার্থিক বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতি সম্বন্ধে যে লোকপ্রচলিত ধারণা ছিল, অনেক স্থলেই উহার সহিত স্বামীজীর আচরণের বৈপরীত্য দেখা যাইত, যেজন্য যাঁহারা প্রাচীনপন্থী

উহাদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে ভ্রষ্টাচার বলিয়াই মনে করিতেন। অপরপক্ষে তাঁর দেশাত্মবোধক, বীরত্বব্যাঞ্জক ও সমাজকল্যাণমূলক অগ্নিগর্ভ কথাবার্তা ও ভাবভঙ্গি দেখিয়া, তাঁহাকে একজন ছদ্মবেশী রাজনৈতিক সন্ন্যাসী বলিয়া মনে করিবার মতো লোকেরও একান্ত অভাব ছিল না। কিন্তু স্বামীজী সম্বন্ধে এরূপ কোন ধারণাই যে যথার্থ নয়, তাঁর নিজের উক্তি এবং সেইসঙ্গে তাঁর ভাব ও চিন্তাধারার সহিত সম্যকপরিচিত ব্যক্তিগণের কথাকেই উহার প্রমাণস্বরূপে গ্রহণ করিতে হয়। মনে হয়, স্বামীজীর বহুমুখী প্রতিভা, লোককল্যাণ-চিকীর্ষা এবং সত্যের প্রতি অবিচল নিষ্ঠাই ব্যক্তিবিশেষকে বিশেষ বিশেষ ভাবে ভাবিত বা অনুপ্রাণিত করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে নানাপ্রকার ধারণাসৃষ্টির অবকাশ ঘটাইয়াছিল।

এবারে, স্বামীজির সহিত নেতাজীর কর্মধারা অথবা মতামতের ঐক্য বা অনৈক্য লইয়া যে কথা হইতেছিল, বাস্তব ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতের অধঃপতনের কারণ সম্বন্ধে নেতাজীর যে নিম্নোক্ত বিশ্লেষণ উহা হইতেও সে বিষয়ে কিছুটা অনুমান করা যাইতে পারে -- (১) অদৃষ্ট ও অতিপ্রাকৃত ব্যাপারে অগাধ বিশ্বাস, (২) আধুনিক বৈজ্ঞানিক উন্নতি সম্বন্ধে ঔদাসিন্য, (৩) আধুনিক যুদ্ধ বিদ্যায় পিছাইয়া পড়া, (৪) পরবর্তীকালের দার্শনিক চিন্তা হইতে উদ্ভুত নিরুপদ্রব আত্মসন্তুষ্টিরভাব এবং অহিংসার (non violence) প্রতি মাত্রাজ্ঞানহীন অনুরাগ। (ভারতের মুক্তিসংগ্রাম - ১ম খন্ড - ১৯২০-১৯৪২)। একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলেই দেখা যাইবে যে, দেশকল্যাণব্রতী মুক্তিযোদ্ধা সুভাষচন্দ্রের পরবর্তী জীবনের কর্মপদ্ধতি তাঁর এই সকল ধারণা অথবা সিদ্ধান্তের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল। অন্যপক্ষে স্বামীজির দিক হইতে দেখিলে বলিতে হয়, যদিও সুভাষচন্দ্রের নিজের কথামত তাঁহাকেই তিনি জীবনের আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁর প্রদর্শিত পথই তিনি বাছিয়া লইয়াছিলেন, তবুও কিন্তু তাঁর এই সকল ধারণা অথবা কার্যকলাপের সহিত স্বামীজীর নিজস্ব ভাবধারার যে সম্পূর্ণ ঐক্য ছিল, একথা বোধহয় কোনক্রমে বলা চলে না। বস্তুতঃ এরূপ না হওয়াটাই ছিল স্বাভাবিক, এবং

সেইজন্যই বিবেকানন্দ ছিলেন বিবেকানন্দ, আর সুভাষচন্দ্র সুভাষচন্দ্রই! পিতা ও পুত্র –গুরু ও শিষ্য, যেমন এক হইয়াও পৃথক, আবার পৃথক হইয়াও এক!

সে যাহাই হোক, কথায় কথায় মনে পড়িয়া গেল নেতাজী সম্বন্ধে একটি সুখস্মৃতি। বহুকাল আগে হরিদ্বারে বেড়াইতে গিয়া একদিন গঙ্গাতীরে অশ্বপৃষ্ঠে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের বীরত্বব্যঞ্জক একখানি বিরাট প্রতিকৃতিতে হাওয়ায় দুলিতে দেখিয়া আমার নিজের প্রাণমনও সেদিন আপনাকে বাঙ্গালী বলিয়া – নেতাজী যেখানে জন্মিয়াছিলেন নিজেকে সেই দেশেরই একজন মানুষ মনে করিয়া, আনন্দে-গর্বে দুলিয়া উঠিয়াছিল। কেবল গঙ্গাতীরেই নয়, প্রতিটি পানের দোকানে, মুচির দোকানে - দূরদূরান্তে হিমালয়ের অভ্যন্তর পর্যন্ত সর্বত্রই সেদিন চোখে পড়িয়াছিল নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ছোট বড় নানা আকারের রঙ্গিন ছবি এবং তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধা নিবেদন – সারা ইতিহাসেও যার তুলনা মেলা ভার! কিন্তু কি আশ্চর্য! মাত্র কয়েকটি বৎসর যাইতে না যাইতেই 'চন্দ্র' রাহুগ্রস্ত হইয়া পড়িল! কেবল সুভাষচন্দ্রই নন, ভারতাকাশে স্বামী বিবেকানন্দের মতো সূর্যকেও সেদিন এইভাবে ম্লান হইয়া পড়িতে হইয়াছিল। এই দুঃসময়ের কথাতেই, কয়েক দশক আগে এক ২১শে জানুয়ারী ১৯৬০ তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত 'স্বামী বিবেকানন্দকে কি আমরা ভুলিতে বসিয়াছি?' শীর্ষক নিবন্ধটিতে বর্তমান লেখককে গভীর দুঃখের সাথেই বলিতে হইয়াছিল - 'স্বামী বিবেকানন্দকে আমাদের ধর্মজীবন, সমাজ জীবন, এমন কি রাজনৈতিক জীবন হইতেও দূর করিয়া রাখিলে উহা আমাদের অগৌরবেরই কথা - যুক্তিহীনতারই প্রমাণ।' স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে সেদিন যা বলা হইয়াছিল, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সম্বন্ধেও অনেকাংশেই আজ সেই একই কথা বলিতে হয়! তবে সাম্প্রতিক ঘটনাবলিতে তাঁর সর্বভারতীয় নেতৃত্বের স্বীকৃতি সূচিত হইতে দেখিয়া আমরা আনন্দিত।

পরিব্রাজক কৃষ্ণানন্দ **শ্রী অমরেন্দ্রকুমার ঘোষ**

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দর পূর্বযুগে যে মনীষী সারা ভারত বিশেষ করে উত্তরভারতে ধর্ম ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ সংবাহকরূপে আত্মপ্রকাশ করেন তিনি হলেন পরিব্রাজক কৃষ্ণানন্দ। তাঁর অসাধারণ বাগ্মিতা ও অধ্যাত্মশক্তির বলে তিনি সনাতন ধর্মের পুনঃপ্রচার ও প্রতিষ্ঠা করেন।

এনার উৎসাহে ভারতের বিভিন্ন স্থানে পাঁচশোর বেশী আর্যসভা ও হরিসভা গড়ে ওঠে।

পশ্চিম বাংলার ভাগীরথী তীরে গুপ্তিপাড়া গ্রাম। এখানে ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন কৃষ্ণানন্দ। পিতা ঈশ্বরচন্দ্র সেনের মধ্যম পুত্র ইনি। মায়ের নাম ভবসুন্দরী। কৃষ্ণানন্দর বাল্যকালের নাম ছিল শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন। সংসারে নিদারুণ অভাব। তাই পড়াশুনো বেশী করতে পারেন নি। মাত্র আঠারো উনিশ বছর বয়সেই লেখাপড়া বন্ধ করতে বাধ্য হন।

জামালপুরে এসে রেলের চাকরী গ্রহণ করলেন কৃষ্ণপ্রসন্ন। এতে করে পরিবারের অভাব অভিযোগ কিছুটা মিটলো। কিন্তু কৃষ্ণপ্রসন্নর মনে এতটুকু শান্তি নেই। সংসারের সুখ তাঁকে তৃপ্তি দিতে পারলো না।

অন্তরসুখের সন্ধানে তিনি এখানে ওখানে ছুটে যেতেন। সাধুসঙ্গ করে তৃপ্তি পেতেন। কখনো বা শাস্ত্রপাঠ ও শাস্ত্রালোচনা করে মনের অশান্তি দূর করতেন। এমনিভাবে চলতে লাগলো তাঁর জীবনের দিনগুলি।

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে মুঙ্গেরের গঙ্গাতীরে কৃষ্ণপ্রসন্ন সাধুদের ভীড়ের মধ্যে থেকে খুঁজে বের করেন দয়ালদাস বাবাজীকে। ইনি ছিলেন পরম যোগী ও উচ্চশ্রেণীর সাধক। কৃপা করে এবং নানারকম পরীক্ষার পর কৃষ্ণপ্রসন্নকে দীক্ষা দিলেন দয়ালদাসজী। কৃষ্ণপ্রসন্ন তাঁর দেওয়া মন্ত্র জপ করতে লাগলেন।

দীক্ষাদানের পর দয়ালদাসজী বললেন, যে কাজের জন্যে আমি এখানে এসেছি আজ তা পূর্ণ হলো। এবার আমাকে ডেরা ডান্ডা তুলতে হবে। একটা কথা

মনে রাখবে কৃষ্ণ, আমাকে দেখবার জন্যে বেশী ব্যস্ত হয়ো না। প্রয়োজনমত সময় হলে তুমি আমার দেখা পাবে। এই বলে দয়ালদাসজী মুঙ্গের ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যান। কৃষ্ণপ্রসন্নও গুরুর দেওয়া বীজমন্ত্রটি সযত্নে লালন করতে থাকেন। সাধন ভজনের দ্বারা সেই বীজ কালে মহীরূহে পরিণত হলো।

পিতামাতা দেহ রাখলে কৃষ্ণপ্রসন্ন নির্ভয়ে বাধাবন্ধনশূন্য হয়ে ভারতের বিভিন্ন স্থানে ধর্মপ্রচার করে বেড়ালেন। গেলেন হরিদ্বারের কুম্ভ মেলায়। সেখানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধু ও যোগীদের সঙ্গে ধর্মপ্রসঙ্গে আলাপ আলোচনা করলেন।

দক্ষিণেশ্বরে এসে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখে গেলেন। তাঁর মাহাত্ম্য একটা পত্রিকা মারফৎ উত্তর ভারতে প্রচার করলেন।

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দ। এই বছরে কোলকাতায় এলেন কৃষ্ণানন্দ। এখানে গঙ্গার তীরে তাঁর পরম গুরু দয়ালদাসজী ডেরা পেতেছেন। তাঁর চরণে আশ্রয় নেন কৃষ্ণপ্রসন্ন। আরো অনেক ভক্ত এসে দয়ালদাসজীর পুণ্য চরণে লুটিয়ে পড়ছে। দয়ালদাসজী কৃপা করছেন সকলকে।

পরে একসময় ডাকলেন প্রিয়তম শিষ্য কৃষ্ণপ্রসন্নকে। এবার শিষ্যের মধ্যে ভাবান্তর উপলব্ধি করলেন। একুশ বছর ধরে কঠোর ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করেছেন কৃষ্ণপ্রসন্ন।

এবার সে ব্রত ভঙ্গ করে সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষা দেবার জন্যে মনস্থ করলেন গুরুদেব। জাতিকুল শিখাসূত্র ত্যাগ করতে বললেন কৃষ্ণপ্রসন্নকে।

পরে তাঁকে দিলেন সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষা। এবার থেকে তাঁর নাম হল শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী। এরপর গুরুর আদেশক্রমে কৃষ্ণানন্দ ওখানকার এক জ্ঞানপন্থী মহাপুরুষের আশীর্বাদ গ্রহণ করেন।

জ্ঞানপন্থী মহাপুরুষ কৃষ্ণানন্দকে আশীর্বাদ জানালেন। তারপর বললেন - বাচ্চা, লোকে বলে চক্ষু উন্মীলন করলে বস্তু দেখা যায়। কিন্তু এ তাদের ভ্রম। মানুষ যখন মাতৃগর্ভে থাকে তখন দুচোখ বন্ধ করে থাকে। 'বস্তু' অর্থাৎ শাশ্বত পুরুষের

বসতি তখন দেখা যায়। যেদিন থেকে দুচোখ মেলে সে তাকায় সেদিন থেকে দৃষ্টিতে কেবল 'অবস্তু' পড়ে অর্থাৎ মায়াময় জগৎ প্রপঞ্চ। যে 'বস্তু' এর আগে দেখা যাচ্ছিল তার সন্ধান আর তখন পাওয়া যায় না। তাই বলি - বৎস, গুরুর উপদেশ পেয়েছ। এবার চোখ বন্ধ করো। সমাধিস্থ হও। তাহলে আসল বস্তু দেখতে পাবে।

কাশীধামে অবস্থান করছেন কৃষ্ণানন্দ। এই সময় বর্দ্ধমান থেকে এক মহিলা তাঁর কাছে এসে উপস্থিত। মহিলাটির নাম সৌদামিনী দেবী। বড় দুর্ভাগিণী। স্বামী, পুত্র কেউ নেই। দুজনেই অকালে প্রাণ ত্যাগ করেছে। এক সময় তিনি শান্তিলাভের আশায় বৈদ্যনাথধামে এসে হত্যা দেন।

বাবা বৈদ্যনাথ তাঁকে স্বপ্নে দেখা দেন। বলেন সৌদামিনীর গুরু রয়েছে বিশ্বনাথধামে। সেখানে গেলে তার প্রার্থনা পূর্ণ হবে।

কেবল আদেশ দিয়ে ক্ষান্ত হন নি বৈদ্যনাথ। নিজে সৌদামিনীর গুরু কৃষ্ণানন্দর জ্যোতির্ময় মূর্তি দেখিয়ে দেন। সৌদামিনী সেই আদেশমত লোককে জিজ্ঞেস করতে করতে চলে এলেন কাশী ধামে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর দেখা পেলেন অভীষ্ট গুরুর।

কাশীর সেবাশ্রমে দেবী অন্নপূর্ণার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করলেন কৃষ্ণানন্দ। আশ্রমের গুহার মধ্যে বসে দিনের পর দিন যোগসাধনা আর ধ্যান জপ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন কৃষ্ণানন্দ।

এই সময় তাঁর অলৌকিক যোগ বিভূতির প্রকাশ হতে থাকে। অনেক লোককে কৃপা করলেন। ভবব্যাধি-ভবজ্বালা দূর করলেন যোগশক্তির প্রয়োগে। একবার হাতোয়ার মহারাজার এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয় মারাত্মক পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হন। বাঁচার কোন আশা নেই। ডাক্তাররা জবাব দিয়েছেন। মহারাজা কৃষ্ণানন্দর কাছে এসে কৃপা ভিক্ষা করলেন। কৃষ্ণানন্দ কৃপা করলেন। বললেন, রোগীর পক্ষাঘাত ব্যাধি নিরাময় হবে বটে কিন্তু ও আর বেশীদিন বাঁচবে না। ও ব্যাধি থেকে সেরে উঠলে পরে সামান্য জ্বরে দেহ নষ্ট হবে। ক্রমে কৃষ্ণানন্দর ভবিষ্যৎ বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য হল। মহারাজার আত্মীয়টি পক্ষাঘাত রোগমুক্ত হলেন বটে পরে সামান্য

জ্বরে আক্রান্ত হয়ে দেহত্যাগ করেন। এমনিভাবে কত লোককে কৃপা করেছেন কৃষ্ণানন্দ।

বাংলা ১৩০৯ সালে কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয় মূর্তি এই মহামানবের অন্তর্ধান ঘটে। এঁর মত আচার্য, ধর্মবক্তা ও আদর্শ সংগঠক ভারতে খুব কম দেখা যায়।

বড়দিন **শান্তশীল দাশ**

তুমি আস বারে বারে;
যখনি এ ধরা ঢাকা পড়ে যায়
গভীর অন্ধকারে।
পথহারা প্রাণে কি ব্যাকুল তৃষা,
কোথা পথ কোথা? মেলে নাকো দিশা;
আলো দাও, আলো, পথচারী ভাসে
বেদনা অশ্রুধারে।
সেই আহ্বান তুমি শোন, আস
সাথে নিয়ে বরাভয়;
তোমার আলোকে উজ্জ্বল আকাশ
সকল তমসা ক্ষয় ।
জাগে দিকে দিকে আলোকের গান,
জয় জয় জয় হে প্রভু মহান;
অযুত কণ্ঠে আরতি মন্ত্র
ওঠে মন্দির দ্বারে।

DO NOT COPY

মাইকেল কলিন্স, একটি পর্বতাভিযান ও আমরা কয়েকজন **সুনন্দন ঘোষ**

মাইকেল কলিন্সকে মনে আছে আপনাদের? মাইকেল কলিন্স! ১৯৭০ সালের ১১ই জুলাইয়ের ঐতিহাসিক দিনটিতে দূরদর্শনের পর্দায় যখন ফুটে উঠেছে লক্ষ মাইল দূরে পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহটির বুকে মানব সমাজের দুই প্রতিনিধি নীল আর্মস্ট্রং আর এডুইন অলড্রিনের টলোমলো পদক্ষেপের রুদ্ধশ্বাস ছবি, দূর-সমযোজনের দাক্ষিণ্যে পৃথিবীর প্রত্যন্ততম প্রদেশেও ছড়িয়ে পড়েছে সাফল্যের সঙ্কেত - সেই সময় - ঠিক সেই সময় চাঁদের কক্ষপথে পরিভ্রমণ রত মূল মহাকাশযান থেকে ভেসে এসেছিল পরিহাস – "ভুলবেন না যেন, আমিও আছি"- সাফল্যের অপ্রত্যক্ষ অংশীদার - মাইকেল কলিন্স!

১৯৭৮-এর ২৭শে সেপ্টেম্বরের রক্ত হিম করে দেওয়া শীতে ১৪ হাজার ফুট উপরে ভোর বেলার একটা অভূতপূর্ব নাটক এক ঝটকায় আমাদের দশজন ভাবী আর্মস্ট্রংকে মাইকেল কলিন্স এ বদলে দিলো।

অ্যাডভান্সড বেস ক্যাম্প-এ প্রাণ-চাঞ্চল্য শুরু হয়নি তখনও। ত্বিষাম্পতির দক্ষিণ করস্পর্শ স্বর্ণাভ মোহময়তা ছড়িয়ে দিচ্ছে শিগরি হিমবাহের সন্নিকটস্থ তুষারশৃঙ্গে। চারদিকে কেমন একটা হিম হিম ভাব। নেহাতই প্রাকৃতিক প্রয়োজনে স্লিপিং ব্যাগের উষ্ণ-সান্নিধ্য পরিহার করে একজন দুজন বেরিয়ে আসছে তাঁবুর ভিতর থেকে এবং অনতিবিলম্বে গ্লেসিয়েটেড মোরেন-এর চারপাশে ছড়ানো বিশাল শিলাখণ্ডের আড়ালে তাদের মাথাগুলো জলে ডুব দেওয়ার ভঙ্গীতে হারিয়ে যাচ্ছে। এ হেন প্রতিরোমাঞ্চময় পরিস্থিতির মধ্যে কে যেন চেঁচিয়ে উঠল - "অনুপদা! জিতরাম আর তেনজিং আসছে!" ঘুমের আমেজ ছুটে গেল মুহূর্তের মধ্যে। জিতরাম-তেনজিং এত সকালে? কোন দুর্ঘটনা? আজ অগ্রবর্তী প্রথম দলের তৃতীয় শিবির স্থাপন করার কথা লায়ন হিমবাহে। তবে? সম্মিলিত উৎকণ্ঠা তীব্রতর হয়ে উঠে ছিলো ওদের অগ্রসরমান প্রতিটি পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে।

কোন দুর্ঘটনা নয়। সকলেই সুস্থ। গতকাল লায়ন হিমবাহে তৃতীয় শিবির স্থাপনের জন্য স্থান অবেক্ষণ (Recoinnaissance) হয়েছে। আজ শিবির স্থাপনের দিন।

তবু আমাদের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। মনে হল স্নায়ুর মধ্যে লায়ন – এর ম্যাপটার উপর কেউ যেন কালি ঢেলে দিচ্ছে। সে কি এক যন্ত্রণা, কি এক শূন্যতাবোধ। নাগরিক জীবনের যান্ত্রিক উন্মাদনার মধ্যে বসে ভাবতে গেলে বিস্ময়বোধ করা অস্বাভাবিক নয় - ক'জন সপ্রতিভ সুস্থ পাহাড় পাগল ছেলে হঠাৎ কিভাবে দুই পোর্টার সর্দার-এর হাত ধরে হাউহাউ করে কেঁদে উঠেছিল ওদের কথা শুনে - "হমলোক এক্সপিডিশন ছোড়কে যা রহা হ্যায়। তুমহারা ওহ লীডার (অর্থাৎ মানিকদা) হমকো গালি দিয়া... " ইত্যাদি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আডভান্সড বেস ক্যাম্পের তিন জন সদস্য ক্যাম্প-১ এর উদ্দেশ্যে রওনা হল প্রকৃত তথ্যের সন্ধানে। দুপুর নাগাদ ফিরে এসে তারা জানাল সকালের ঐ অঘটনের উৎস মানালী থেকে সংগৃহীত ছয় পোর্টারের সঙ্গে দার্জিলিং থেকে আগত দুই শেরপা এবং চার পোর্টারের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। আঞ্চলিক অধিকারবোধের তাড়নায় মানালীর পোর্টার সর্দার তেনজিং চেয়েছিল এই অভিযানের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করতে। প্রত্যেকবারই ম্যাপে নির্দেশিত স্থানের অনেকটা আগেই তারা চেষ্টা করেছিল শিবির প্রতিষ্ঠার। উদ্দেশ্য সম্ভবতঃ নিজেদের শ্রান্তি ও অক্ষমতাকে গোপন করা এবং অভিযানের দিন বাড়ানো। দুই শেরপা সোনা, নিম দোরজি এবং মাণিকদার বিপুল অভিজ্ঞতা তাদের অভীষ্ট সিদ্ধির অন্তরায় হওয়ায় তাদের ফিরে যাওয়ার অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত!

তেনজিংকে বাধা দেওয়ার আর চেষ্টা করিনি আমরা। তার দলের অন্যান্যরা অনিচ্ছুক ছিল ফিরে যেতে। ভুল পথে চলা সর্দারকে অনুসরণ করে তাদের ফিরে যেতে হল ঐ দিনই, সমস্ত দেনা পাওনার হিসেব চুকিয়ে।

প্রথম অভিযানের দ্বিতীয় পর্যায়ে এই অকল্পিত বিপর্যয় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় অনভিজ্ঞ একদল তরুণকে ঠেলে দিল মহত্তর ভাবনার দিকে। সন্ধ্যার আগেই ঐ অ্যাডভান্সড বেস ক্যাম্পে বসে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম - পরিস্থিতির সাপেক্ষে প্রয়োজন হলে অগ্রবর্তীদলের তিনজন সদস্য মাণিকদা (মাণিক ব্যানার্জী), কালোবাপ্পা (দেবাশীষ দাস) এবং শিব (শিব শঙ্কর মুখার্জী) 'লায়ন শীর্ষের' দিকে এগিয়ে যাবে। আর অবশিষ্ট এগারো জন সরবরাহ ব্যবস্থা রক্ষা করবে শিবির থেকে শিবিরান্তরে। 'সিংহের' পিঠে সওয়ার হওয়ার ব্যক্তিগত অভীপ্সা হয়তো সকলেরই ছিল অল্পবিস্তর - কিন্তু তার থেকে অনেক বেশী ছিল দলীয় সংহতি ও সাফল্যের প্রতি আনুগত্য। তাই প্রথম সারি থেকে হঠাৎই দ্বিতীয় সারিতে পিছিয়ে গিয়ে নীল আমস্ট্রং-এর পরিবর্তে মাইকেল কলিন্স হয়ে যাওয়ায় কিছু দুঃখবোধ জাগেনি বলবো না, কিন্তু সেই সাময়িক বিষাদ আবৃত হয়েছিল আত্মত্যাগের ভাবনার দ্বারা।

মানালীর পোর্টারদের আকস্মিক পশ্চাদপসারণই কিন্তু 'লাহুল হিমালয়ান সায়েন্টিফিক এক্সপিডিশন-১৯৭৮'-এর প্রথম বা শেষ দুর্ঘটনা নয়। একটা অন্তর্বর্তী অধ্যায় মাত্র। যাদবপুর ইউনিভার্সিটি মাউনন্টেনিয়ারিং এন্ড হাইকিং ক্লাবের উদ্যোগে - যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কেন্দ্রীয় সরকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং অন্যান্য সরকারী-বেসরকারী সংস্থার আনুকূল্যে আয়োজিত, তেরোজন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র (দলনেতা অনুপ বনিক চৌধুরী, সহনেতা সুনন্দন ঘোষ এবং সদস্যবৃন্দঃ অমৃত মুখার্জী, অমিত মাইতি, অমর মল্লিক, দেবাশীষ দাস, হরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, স্বপন দাস, রাজকুমার বোস, অনুপম রায় পালোধি, রাজরঞ্জন রায়, দেবব্রত চক্রবর্তী, শিবশঙ্কর মুখার্জী), দুজন ডাক্তার (শ্রী বিজয় গুপ্তা, শ্রী কাঁকন নাহা), একজন বিশেষজ্ঞ পর্বতারোহী (শ্রী মানিক ব্যানার্জী), দুজন শেরপা (সোনা, নিম দোরজি) এবং চারজন হাই অলটিচ্যুড পোর্টার (নিংমা, সাংগ্রে, ওয়াঙ্গেল) - মোট বাইশ জনে গঠিত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে প্রথম এবং সফল পর্বতাভিযান 'লাহুল হিমালয়ান সায়েন্টিফিক এক্সপিডিশন - ৭৮' - আমাদের জানিয়ে গেল অভিযানের বিভিন্ন পর্যায়ে কত বিচিত্র বিপদ অপেক্ষা করে থাকে অভিযাত্রীদের সাথে হাত মেলানোর

জন্য। পর্বতারোহণ বিষয়ক নামী নামী বইগুলোর পাতায় তাদের সকলের উল্লেখ থাকে না, তবু তারা থাকে পদে পদে। উদ্যোগপর্বে - ভারতীয় পর্বতারোহণ সংস্থা (ইন্ডিয়ান মাউন্টেনীয়ারিং ফাউন্ডেশন)-এর অনুমোদনক্রমে আমাদের প্রস্তুতি শুরু হয়েছিলো গাড়োয়ালের থেলু হিমবাহ সংলগ্ন থেলু এবং একটি অপরাজেয় অনামা শৃঙ্গ (৬১৬১মি.) অভিযানের। কিন্তু ১৯৭৮-এর বর্ষা এবং তৎ-পরবর্তী বন্যার অকল্পনীয় তাণ্ডবে রেলপথ বন্ধ, উত্তরকাশীর যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন। 'গাড়োয়াল হিমালয়ান সায়েন্টিফিক এক্সপিডিশন-৭৮' পরিবর্তিত হলো 'লাহুল হিমালয়ান সায়েন্টিফিক এক্সপিডিশন-৭৮'-এ। হিমাচল প্রদেশের লাহুল ও স্পিতির সীমারৈখিক অঞ্চলে চন্দ্রা নদীর পশ্চিম প্রান্তে বড়া শিগরি হিমবাহ। এই হিমবাহের পাদদেশ থেকে উত্তরাভিমুখে কয়েক মাইল পথ অতিক্রম করলে উত্তর পূর্বে লায়ন হিমবাহের সূচনা। লায়ন হিমবাহের শেষদিকে আমাদের সিংহ (লায়ন) শিকারের স্থান। ১৯৬৪-তে অভাবনীয় দক্ষতার সাথে সেন্ট্রাল এবং লায়নের সফল অভিযান পরিচালনা করেন শ্রীমতী জোসেফিন স্কার। ১৯৭২-এ কলকাতার একটি ক্লাব প্রথম ভারতীয় দল হিসাবে পদচিহ্ন রেখে আসেন দুই পর্বতশীর্ষে। এবার প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পরে আমাদের শেষ মুহূর্তে সংগৃহীত টিকিটে রিজার্ভেশনের অপ্রতুলতা, বন্যার কারণে বেশ কিছু ট্রেন বন্ধ থাকায় যাত্রীর কল্পনাতীত সংখ্যাধিক্য; আড়াই টন লাগেজ - খাদ্য সম্ভার, পর্বতারোহনের সাজ সরঞ্জাম, অথচ বুকিং নেই। হৈ চৈ, ছুটোছুটি উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, ১৪ই সেপ্টেম্বরের সন্ধ্যায় হাওড়া স্টেশনে সে এক বিচিত্র পরিস্থিতি। এরপরও একের পর এক বাধা। দিল্লী থেকে মানালীর যাত্রাপথে কুলুর কাছে একাধিক স্থানে ল্যান্ডস্লাইড হওয়ায় প্রতিটি ক্ষেত্রে ঐ আড়াই টনের ছোট্ট পাহাড়কে বহন করা স্থানান্তরে; মানালী পৌঁছনোর পর 'বাথাল'-এ যাওয়ার যানবাহনের অভাব, পোর্টারের সমস্যা, বাথাল থেকে বেস ক্যাম্প-এ পৌঁছনোর জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক অশ্বেতরর অভাব। তারই মধ্যে চলেছে পোর্টারদের সাথে দর কষাকষি, কলহ, সাজসরঞ্জাম (ইক্যুইপমেন্ট) সংগ্রহের প্রয়াস, ভারত পাকিস্তান হকি-ক্রিকেট, মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল, ঘটি-বাঙ্গাল, পদ্য-প্রেমিকা।

লাহুল সিংহের জন্য বেস ক্যাম্পের পরও স্থাপন করতে হয়েছিল চারটি শিবির - এডভান্স বেস ক্যাম্প (১৪,০০০ ফুট), ক্যাম্প-১ (১৫,০০০ ফুট), ক্যাম্প-২ (১৭,০০০ ফুট), ক্যাম্প-৩ (১৮,৫০০ ফুট)। মৃত্যুপথযাত্রী (dying glacier) বড়া শিগরি হিমবাহ- Moraine, Glaciated moraine, Scree, Crevarse, Tarn-এর জটিলতায় দুর্গম বৃক্ষবর্জিত এক বিপজ্জনক এলাকা। প্রতি পদক্ষেপেই পতনের ইঙ্গিত। আর তুষারপাত হওয়ার পর তো একেবারে মণিকাঞ্চনযোগ। থেলু অভিযানের পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হওয়ায় যখন বিকল্পের সন্ধান চলছিলো তখন দলনেতা অনুপদার কাছে সেন্ট্রাল-লায়নের কথা তুলেছিলাম আমিই, এবং আমারই দায়িত্ব ছিলো ম্যাপ ইত্যাদি সংগ্রহের।

সব বাধাকে উপেক্ষা করে ২রা অক্টোবর দেবাশীষ, মাণিকদা ও শেরপা সোনা আরোহণ করল অজেয় অনামা শৃঙ্গ (১৯,৭০০ ফুট)। অবতরণের সময় Wind slab Avalanche-এর কবলে পড়ে তারা। আইসএক্স, ক্র্যাম্পন এবং ক্যামেরা হারিয়েও সবার প্রাণরক্ষা হওয়াটা এক অলৌকিক ঘটনা নিঃসন্দেহে।

আগেই বলেছি আমাদের এই অভিযানের নীল আমষ্ট্রং হওয়ার ব্যক্তিগত ইচ্ছাগুলিকে শৃঙ্খলিত করে রেখেছিল দলীয় সংহতিবোধ। এবং এই দলগত শৃঙ্খলার কারণেই উপরের ক্যাম্পে যাওয়ার দলনেতার নিজের অভীপ্সাকে মর্যাদা দিলাম আমরা - মহালয়ার সকালে অনুপদা, দেবু এবং রাজরঞ্জন রওনা হল ক্যাম্প-২-এ, আর ঐ দিনই ভূবিজ্ঞানের দুই ছাত্র স্বপন দাস এবং হরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (সাদাবাপ্পা) নেমে গেল নীচের দিকে – "সায়েন্টিফিক এক্সপিডিশন"-কে সার্থকনামা করে তুলতে।

শেষ পর্যন্ত ৫ই অক্টোবর দুজন সদস্য এবং অবশ্যই মাণিকদা, শেরপা সোনা ও নিম দোরজি লায়নশীর্ষে উড়িয়ে দিল জাতীয় এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পতাকা। সাদাবাপ্পা এবং স্বপনদার ভূবিদ্যা (Geology) সম্পর্কিত কার্যাবলী (বিভিন্ন

সংবাদপত্রে ‘স্পিতিতে কয়লা আবিষ্কার’ শিরোনামেই যা ঐ সময় সর্বাধিক প্রচার পেয়েছিল) - ভিন্নমুখী আঙ্গিক থেকে সমৃদ্ধতর করে তুললো বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অভিযানের গৌরবকে।

পাশ্চাত্যবিশ্বে পর্বতারোহণ এক প্রাচীন ক্রীড়ানুষ্ঠান। ইতিহাস খুঁজলে আমরা দেখতে পাই ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দের ৯ই আগষ্ট Doctor Michel Gabriel Paccard এবং সহযাত্রী Jacues Belmet-এর ইউরোপের ‘Monarch of mountains’-‘Mont Blanc’-এ আরোহণ এর ইতিবৃত্ত। এমনকি “The dawn of mountaineering for its own sake was ushered in on 17th September 1854, when Sir Alfred Willis, then a barrister of twenty eight and subsequently a judge, made the first ascent of the Matterhorn from Grindelwald”। (James Lovelock).

প্রথম ভারতীয় পর্বতাভিযান সংগঠিত হয় ১৯৫১ সালে। শ্রীগুরুদয়াল সিং-এর নেতৃত্বে ১৯৫১-র ২১শে জুন গাড়োয়াল হিমালয়ের খ্যাতনামা শৃঙ্গ ত্রিশূল আরোহণের মাধ্যমে বিশ্বের পর্বতারোহণের ইতিহাসে ভারতবর্ষের নাম লিপিবদ্ধ করে দেন মেজর এন ডি জয়াল, সুরেন্দ্রলাল প্রমুখ বিশ্রুতনামা পর্বতারোহীবৃন্দ। ১৯৫৩-য় তেনজিং-এর এভারেস্ট আরোহণ ভারতবাসীর পর্বতারোহণের উন্মাদনাকে বিরাটভাবে উদ্দীপিত করে। তারপর ক্রমান্বয়ে দক্ষতা অর্জনের ইতিবৃত্ত - কখনো সার্থকতায়, কখনো আপাত ব্যর্থতায়। আর ইতিহাসের সেই পথরেখা ধরেই এই ‘লাহুল হিমালয়ান সায়েন্টিফিক এক্সপিডিশন-৭৮’।

নিত্যদিনের দহনে আমরা সেই মানসিকতা অর্জনের সাধনা করে চলেছি যার শক্তিতে আমরা বলতে পারব-

‘জীবনই সত্য শুধু, মৃত্যু শুধু ছদ্মবেশ তার
জীবনই ক্ষণিক মৃত্যু ততকালে যতকালে পুনঃ

DO NOT COPY

আচম্বিতে জেগে উঠি জীবনে আবার। - (শ্রীঅরবিন্দ)

বলব-

"When life is dull,
Or, when my heart is full
Because my dream have frowned,
I wander up the rills,
To stones and tarns and hills-
I go there to be crowned."

DO NOT COPY